ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 210-217
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.451

বৌদ্ধদর্শনে পরিবেশ ভাবনা এবং বর্তমান পরিবেশগত সংকট সমাধানে বৌদ্ধদর্শনের ভূমিকা

অস্মিতা চ্যাটার্জী, *অতিথি অধ্যাপিকা, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 01.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

As the modern world faces severe crises such as climate change, excessive pollution, and the depletion of natural resources, ancient Buddhist philosophy offers a timeless and ethical solution. This essay argues that the root cause of the current environmental crisis lies in humanity's unbridled greed (Tanha) and moral decline. The inseparable relationship between humans and nature, as illustrated in the life and teachings of Gautama Buddha, provides a lesson in restraint and empathy for today's consumerist society. Drawing upon various instances from the Tripitaka, Jataka, and Dhammapada, the essay demonstrates that Buddhism emphasizes environmental conservation alongside spiritual liberation. It highlights Buddha's forest-centered lifestyle, his instructions on planting and preserving trees, and the relevance of 'Non-violence' (Ahimsa) and 'Loving-kindness' (Metta) toward all living beings—from microscopic organisms to large animals. Furthermore, the paper explores how Buddhist principles like the 'Eightfold Path' and 'Dependent Origination' (Pratityasamutpāda) help in understanding the mutual interdependence between humans and the environment. It posits that practicing 'Right Action' and 'Right Livelihood' is essential for ecological protection. Ultimately, the essay calls for a balanced world built by integrating science and technology with the moral framework of Buddhist philosophy.

Keywords: Ethics/morality, Non-violence (Ahimsa), Eightfold Path, Environmental crisis, Gautama Buddha, Craving/ desire, Dependent Origination (or Dependent Arising) etc

পরিবেশ বা 'Environment' শব্দের অর্থ হল পারিপার্শ্বিক অবস্থা। ইংরেজি শব্দ 'Environment' ফরাসী শব্দ 'Environ' থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ নির্দিষ্ট পরিমন্ডলীকৃত এক নির্দিষ্ট এলাকা — to encircle or to surround. United Nations Environment programme (১৯৭৬) এ দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে "পরিবেশ বলতে পরস্পর ক্রিয়াশীল উপাদানগুলির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সেই প্রাকৃতিক ও জীবমন্ডলীয় প্রণালীকে বোঝায় যার মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সজীব উপাদানগুলি বেঁচে থাকে, বসবাস করে।"[১] এই পরিবেশ আজ বিপন্ন। বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে আমরা উন্নতি করেছি, পৃথিবী এসেছে হাতের মুঠোয়, তার ফলে পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে ঘটা ঘটনা অপর প্রান্তেও প্রভাব ফেলছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ২০০৪ সালে সুমাত্রার ভূমিকম্প এবং দ:পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র যেমন-ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কায় ঘটা সুনামি, সিচুয়ান ভূমিকম্প এবং ২০০৮ সালে মায়ানমারে ঘটা 'নার্গিস' ঘূর্ণিঝড় সমগ্র পৃথিবীকে নাড়িয়ে

দিয়েছিল, তখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিল। বর্তমানে সবচেয়ে বড় পরিবেশ সংকট হল বায়ুদূষণ। ২০২২ এর State Global Air Report অনুযায়ী প্রায় ১.৬ মিলিয়ন মানুষ বায়ুদূষণের জন্য মারা গিয়েছে। বর্তমান পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে কিছু হল, জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রিনহাউস এফেক্ট, বিশ্ব উষ্ণায়ন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বায়ুদূষণ, জলদূষণ, মৃত্তিকাদূষণ, শব্দদূষণ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, বনভূমি ধ্বংস। এই শতাব্দীর শুরু থেকে এখনও অবধি ১৭ শতাংশ বনভূমি অবলুপ্ত হয়েছে ভারত থেকে। পৃথিবীর সমগ্র কৃষিজমির ৪৩ শতাংশ ভূমি অবনমনের জন্য নষ্ট হচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছে ২০৪০ সালের মধ্যে মাটির শস্য উৎপাদন ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষের ভোগলালসা এমনই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সাময়িক আরামের জন্য মানুষ ভবিষ্যৎকেই অনিশ্চিত করে তুলছে। সমগ্র পৃথিবীর ফুসফুস যে বৃষ্টিঅরণ্য, তা আজ চরম সংকটের মুখে। মানুষ ভুলে যাচ্ছে যে এই বাস্তুতন্ত্রের কোনো একটা অংশ বিলুপ্ত হলে, সমগ্র জীবপ্রজাতিই বিলুপ্ত হবে। মানুষ আজ প্রাকৃতিক সম্পদের যেরকম মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করছে, তাতে এটাই প্রমাণিত যে সে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে ভাবিত নয়। স্বার্থচরিতার্থতাই এই পরিবেশগত সংকটের কারণ। মানুষ বস্তুর প্রতি আসক্ত। সেই আসক্তি থেকে একটা মনোরম জীবন কাটানোর অদম্য বাসনা থেকেই সে পরিবেশকে সংকটের মুখে পতিত করছে। মানুষ উন্নতি করছে কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি পরিচালিত হচ্ছে অকুশল মনোবৃত্তির দ্বারা। তাই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে তৈরী করছে পারমাণবিক বোমা, অস্ত্র, কীটনাশক, ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে চাষি চাষের জমিতে তাই বিষরূপী সার, কীটনাশক প্রয়োগ করতেও দুবার ভাবছে না।

খাদ্য প্রস্তুতকারক সংস্থা, হোটেলের মালিকদের নৈতিকতা আজ বিলুপ্তির পথে। তাই খাবারে ভেজাল মেশাতেও তারা দুবার ভাবছে না। প্রত্যেকে নিজের জীবিকা অসৎ উপায়ে পালন করছে। তাই সেটার প্রভাব পরিবেশেও পড়ছে। আমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করছি। প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত কিন্তু আমাদের চাহিদা ও লোভ সীমাহীন। পরিবেশের সমস্যার পশ্চাতে কী কারণ রয়েছে তা যদি আমরা অনুসন্ধান করতে যাই, তাহলে দেখব এর মূলীভূত কারণ আমাদের নৈতিকতার অধ:পতন। আমাদের নিয়ন্ত্রণহীন বাসনাই এই সংকট সৃষ্টি করেছে। তাই বর্তমান পরিবেশগত সমস্যা মূলত নৈতিক সমস্যা। মানুষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে, বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে এই সংকটের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে সবটা হবে না। সরকারি উদ্যোগ, দ্রুত পদক্ষেপ যে নেওয়া দরকার এটা ঠিক, কিন্তু মানুষের নৈতিক বোধ জাগ্রত না হলে, সুদূরপ্রসারী কোনো সমাধান হবে না। আর এই পরিবেশ সংকটের সমাধান দিতে পারে বৌদ্ধদর্শন। বৌদ্ধধর্মের আধিবিদ্যক তত্ত্ব এবং নৈতিক তত্ত্বগুলোকে যেমন বর্তমান সময়ের সংকট সমাধানে কাজে লাগানো যেতে পারে তেমনই বুদ্ধ স্বয়ং পরিবেশরক্ষার ব্যাপারে বেশ কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাই বৌদ্ধধর্ম যে পরিবেশ নিয়ে কতটা ভাবিত ছিল তা দেখে বিস্ময় জাগে। বুদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের যে উপদেশ বা নিয়ম বলতেন তার মধ্যে, বৌদ্ধ অন্যান্য সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে আছে পরিবেশরক্ষার বার্তা। তাই আজকের সংকটময় পৃথিবীতে দিশা দেখাতে পারে মহামতি বুদ্ধের দর্শন। ত্রিপিটক, জাতকের কাহিনী, ধম্মপদ, অট্ঠকথা— বহু জায়গায় বৌদ্ধ পরিবেশ সচেতনতার নিদর্শন মেলে। বৌদ্ধধর্ম আসলে কতগুলো তত্ত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। দুঃখমুক্তির উপায়ের মধ্যেও পরিবেশ সচেতনতার ছোঁয়া আছে। অর্থাৎ দুঃখমুক্তি তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, একজন মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিকে যে নির্দেশ পালন করতে বলেছেন বুদ্ধদেব, তার মধ্যে এমন অনেক পালনীয় কর্তব্য কথা বলা হয়েছে, যেটার দ্বারা পরিবেশ উপকৃত হবে। বৌদ্ধ ধর্ম তত্ত্ব ও প্রয়োগের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ, যেখানে শুধুই তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির উপায় নয়, মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তি যদি কিছু পালন না করে, যা শিখল তার প্রয়োগ না ঘটায়, সে নির্বাণ পাবে না।

পরিবেশ সংরক্ষণে বুদ্ধের উপদেশ: গৌতম বুদ্ধের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি অরণ্যেই হয়েছে। তাই তাঁর সঙ্গে অরণ্যের এক গভীর সম্পর্ক আছে। তাঁর জন্ম হয় লুম্বিনীতে শাল গাছের নিচে। তিনি বোধি লাভ করেন অশ্বত্থ গাছের নিচে। বোধিলাভের পর সারনাথের যেখানে তিনি প্রথম ধর্মদেশনা দেন সেটিও অরণ্য ছিল— মৃগদাব অর্থাৎ হরিণের অরণ্য। মহাপরিনিব্বাণ সুত্তেও উল্লেখ আছে যে কুশীনগরে শাল গাছের মাঝেই তিনি মহাপরিনিব্বাণ লাভ করেন। প্রশ্ন হতে পারে, কেন তিনি বৃক্ষকেই বেছে নিয়েছেন বারবার? এর উত্তর এটাই যে, তিনি মানবজীবনের সঙ্গে বৃক্ষের সুগভীর সম্পর্ককে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর বৃক্ষের নিম্নে বোধিলাভ করা একথাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে পারলে তা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতেও সাহায্য করে।

সুত্ত পিটকের খুদ্দক নিকায়ের সুত্ত নিপাতের উরগ বর্গের কসল সুত্তে বুদ্ধ অগ্নিকভরদ্বাজ নামক ব্যক্তিকে বহিষ্কৃত ব্যক্তির বিভিন্ন অর্থ বলেন। অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে বহিষ্কৃত ব্যক্তি বলা হবে। তার মধ্যে অন্যতম হল, "এই পৃথিবীতে যদি কেউ কোনো জীবকে হত্যা করেন, একবার জন্ম বা দুবার জন্মে, যাই হোক না কেন, এবং যার মধ্যে জীবের প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই, তাকে বহিষ্কৃত বলা হবে।"[২]

এ ছাড়াও বিনয়পিটকে আমরা একটি গল্পের উল্লেখ পাই যেখানে বলা হচ্ছে, ধনিয়া নামের একজন ভিক্ষু যে, মৃতশিল্পীর পুত্র, সে তার নিজের জন্য মাটির কুঁড়েঘর বানিয়েছিল। সেটাকে সুন্দর রূপ দেওয়ার জন্য সে সেটাকে খুব ভালো করে পুড়িয়েছিল যাতে রঙ ভালো আসে। কিন্তু পোড়ানোর ফলে যেহেতু মাটির মধ্যে থাকা অণুজীব মারা যেতে পারে, তাই বুদ্ধ তাকে তিরস্কার করেছিলেন।[৩] এছাড়াও আলাভি প্রদেশের কিছু ভিক্ষুকে বুদ্ধ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যে জলে কিছুমাত্রও পোকামাকড় আছে, সেই জল ঘাস বা মাটিতে না ফেলতে। যদি কোনো ভিক্ষু এরম করেন, তার জন্য পাচিত্তিয় নিয়ম ছিল। বুদ্ধ এই নিয়মও করেছিলেন যে, বর্ষাবাসের সময় ভিক্ষুরা সংঘেই থাকবে, এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াবে না। কারণ, এর ফলে ক্ষুদ্র প্রাণী, উদ্ভিদ পায়ের চাপে পিষ্ট হতে পারে। গাছের নিচে বসার সময় এমনভাবে দেখে বসা উচিত যাতে গাছের ক্ষতি না হয়। যেহেতু সবুজ গাছপালা ও জল মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাই তার ওপর প্রস্রাব না করার, থুথু না ফেলার, মলত্যাগ না করার নিয়ম ছিল। কোনো ভিক্ষু তা করলে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হত। কিছু বৌদ্ধ গ্রন্থ সরাসরি দাবি করছে যে, রাজা বা শাসকেরই দায়িত্ব পরিবেশের রক্ষা করা। এগুলির মধ্যে চক্কবত্তি সীহনাদ সুত্ত অন্যতম, যেখানে বলা হচ্ছে, রাষ্ট্রের শাসকের উচিত সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুলকে রক্ষা করা। বলা হচ্ছে রাজাকে দেখেই বাকিরা শিখবে।[৪] বৌদ্ধধর্ম লাগামহীন বাসনা শেখায় না। যে ব্যক্তির বাসনা কম, সে প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করবে না। সে আহার মধ্যম পরিমাণ করবে, পরিধানের জন্য কাপড়ও সে প্রয়োজনের বেশি ব্যবহার করবে না। তাঁর জীবনযাপন এমন কিছুই চাইবে না যার জন্য পরিবেশের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে। বৌদ্ধধর্ম আমাদের এই মধ্যমপন্থা শেখায়। অতকাল আগেও বৌদ্ধধর্ম সমাজকে পুনর্নবীকরণের শিক্ষা দিয়ে গেছে, অর্থাৎ যেটা এখন 3R (Reduce, Reuse, Recycle) বলে খ্যাত। এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একবার ভিক্ষু আনন্দ রাজা উদেন এর কাছে বলেছিলেন যে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা কীভাবে বস্ত্র ব্যবহার করেন। যখন নতুন বস্ত্র তারা পান; পুরোনো বস্ত্রকে তারা বিছানার চাদর রূপে ব্যবহার করেন, সেটা যখন পুরোনো হয়, গদির ঢাকা হিসেবে ব্যবহার করেন, সেটি পুরোনো হয়ে গেলে কম্বলরূপে, আরও পুরোনো হলে তাকে ঝাড়ন রূপে। তবে এখানেই শেষ নয়; শেষে একেবারে জীর্ণ হলেও তারা যে ফেলে দিতেন তা নয়, সেই জীর্ণ কাপড়ের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে মণ্ড করে, তা দিয়ে তারা দেওয়াল, মেঝ মেরামতির কাজ ব্যবহার করতেন। এভাবে কোনো কিছুই ফেলা যেত না। ছাড়াও পালি ভাষায় একটা শব্দ আছে, যার নাম Kataññu - Katavedi, যেটা কৃতজ্ঞতা শেখায়। কথিত আছে বুদ্ধ নাকি বোধি লাভ করার পর বোধিবৃক্ষের দিকে অনিমেষ নেত্রে এক সপ্তাহ তাকিয়েছিলেন। কারণ, গাছটিই তাকে ধ্যান করার

আশ্রয় দিয়েছিল। এইভাবে প্রকৃতির প্রতি বুদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন। বুদ্ধ শুধু গাছপালার প্রতিই নন, পশুপাখির প্রতিও করুণাপরবশ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম বেদের পশু হত্যার বিরোধিতা করেছিল। যজ্ঞকর্মে পশুর বাঁচার আর্তনাদ বুদ্ধকে পীড়িত করেছিল। ধর্মের নামে নিরীহ পশুর প্রতি এই অত্যাচার তিনি মেনে নিতে পারেননি। কথিত আছে একজন ব্যক্তি পশু বলি দিতে গেলে বুদ্ধ তাকে জিজ্ঞেস করেন যে সে এরকম কেন নিরীহ পশুদের হত্যা করছে? এর উত্তরে সে বলে যে, "ভগবান এতে খুশি হবেন।" বুদ্ধ তখন স্বয়ং নিজেকে যজ্ঞের বলির নিমিত্ত নিবেদন করতে উদ্যত হয়ে বলেন, "সামান্য একটা ছোট পশুর প্রাণ ভগবানকে এত খুশি করলে, মানুষের প্রাণ পেলে তো তিনি আরও বেশি খুশি হবেন।"

ভূতগমবগ্গ পাচিত্তিয় কান্ডে ভিক্ষুদের গাছ কাটা নিষিদ্ধ ছিল। সবুজ ঘাস বা জলে মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল। ভিক্ষুণীদের জানালা দিয়ে বাইরে বা ফসলের ওপর কোনো আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ ছিল।[৫] রতন বগ্গতে উল্লেখ আছে ভিক্ষুরা হাড়, দাঁত, শিং-এর তৈরী জিনিস ব্যবহার করতে পারবেন না।[৬] মহাসতিপট্ঠান সুত্তে বুদ্ধ যথার্থ স্থান হিসেবে অরণ্য, বৃক্ষের নিম্নভাগ, শান্ত ও নির্জন স্থানের কথা বলেছেন।[৭] এর থেকেই বোঝা যায় বৌদ্ধধর্মে পরিবেশের ওপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিনয় পিটকের পাচিত্তিয় অংশের উদ্ভিদ বর্গের প্রথমেই বুদ্ধ ভিক্ষুদের অনুজ্ঞা দেন মূলবীজ অর্থাৎ হরিদ্রা, আদা বচা (একপ্রকার ফুল), অতিবিসা (একজাতীয় গাছ বা লতার ওষুধি বিশেষ), কুটকরোহিনী (মরিচ জাতীয় ওষুধি) ইত্যাদি অর্থাৎ, যে গাছের আগা কেটে রোপণ করলে অঙ্কুরিত হয়, এমন বৃক্ষবিশেষ এবং ধান, গম, মুগ ইত্যাদি উদ্ভিদ নষ্ট না করতে। এই বর্গের শেষে বলা হয়েছে, প্রাণীযুক্ত জল বৃক্ষ, লতা-পাতাতে সেচন না করতে। বুদ্ধ নির্দিষ্ট যে তের প্রকার ধূতাঙ্গ ব্রত (ভিতরের ব্রত) তার মধ্যে আট নং ধূতাঙ্গ ব্রত হল আরণ্যক। অর্থাৎ, ভিক্ষুকে অরণ্যে বাস করে সেই ব্রত পালন করতে হবে। ভিক্ষুদের দীক্ষা দেবার সময়ও বৃক্ষমূলকেই সর্বাগ্র বিবেচ্য আবাস হিসেবে বেছে নেওয়া হত।[৮] আচার্য বুদ্ধঘোষ প্রণীত বিশুদ্ধিমার্গে বলা হয়েছে—

"বন্নিতো বুদ্ধ সেট্ঠেন নিস্সয়োতি চ ভাসিতো
নিবাসো পারিবিত্তস্স রুক্খমূলসমে কুতো?"

অর্থাৎ, বুদ্ধশ্রেষ্ঠ কর্তৃক প্রশস্ত আশ্রয়স্থল বলে কথিত বৃক্ষমূলের সমান একাকী বিহারীর নিবাস আর কোথায়?[৯]

ধম্মপদ, জাতক ও অন্যান্য বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিবেশ সচেতনতা: মানুষ তার জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণরুপে নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদ গৃহীত না হলে, মানুষ একমুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারবে না। তাই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য সম্পদ শুধু সেটুকুই প্রকৃতি থেকে আমাদের আহরণ করা কর্তব্য, ততোধিক নয়। এটা বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এখন মানুষের প্রয়োজনের বেশি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাড়ি, সামর্থ্য দ্রব্য ও কারোর অনেক বেশি, আবার অন্য একজন অনাহারে ভুগছে। আমরা কীভাবে পরিবেশ থেকে সম্পদ আহরণ করব, তার নির্দেশ ধম্মপদের ৪৯ তম সুক্তে দেওয়া আছে। বলা হয়েছে, "মৌমাছি যেমন পুষ্পমঞ্জুরীর সৌন্দর্য ও সুগন্ধের কোনোরূপ অনিষ্ট সংঘটিত না করেই তার থেকে সুস্বাদু মধু সংগ্রহ করে, তদনুরূপ মানুষের অস্তিত্বের বলবৎ এর জন্য অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য উপাদানই প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করতে হবে প্রকৃতির কোনোরূপ অনিষ্টসাধন না করেই।"[১০] ধম্মপদের দণ্ডবগের ১২৯, ১৩০ নং সূত্রে বলা হচ্ছে, সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে, জীবন সকলের কাছেই প্রিয়। তাই সকলকে নিজের মতো ভেবে কাউকে হত্যা করবে না, আঘাত করবে না।[১১]

মহাসুপিন এই জাতকের গল্প আমাদের দেখায় যে, রাজার খারাপ ব্যবহার কীভাবে জলের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। রাজার অধার্মিক আচরণের জন্য বৃষ্টি সংকট দেখা দিয়েছিল। এর ফলে গাছপালার ক্ষতি ঘটল এবং

দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।[১২] এর থেকে বৌদ্ধরা যে পরিবেশের বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন তা ফুটে ওঠে। এখানে রাজার অধার্মিক আচরণ প্রতীকী, আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এরকম অনাচার করে প্রকৃতির ক্ষতি করে।

নন্দিবিলাস জাতকসহ বিভিন্ন জাতকে গৃহপালিত ও বন্য প্রাণীর প্রতি সহমর্মিতা পোষণের কথা বলা হয়েছে।[১৩] বৌদ্ধধর্ম যে উদ্ভিদকুলের প্রতি অহিংসাত্মক মনোভাব পোষণ করতে শেখায় পেতবুত্থুতেও তার নিদর্শন মেলে। পেতবুত্থুতে উল্লিখিত আছে যে, আশ্রয়ের জন্য কারোর গাছের শাখা-প্রশাখা ভাঙা উচিত নয়।[১৪] যদি কোনো ভিক্ষু ধ্যান করার জন্য বৌদ্ধ সংঘ না পেতেন, তবে বুদ্ধ বৃক্ষের নিম্নে ধ্যান করার উপদেশ দিতেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন যে চর্যাপদ, তা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কর্তৃক রচিত, সেখানেও যে উপমা ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলিও পরিবেশ সংক্রান্ত।

অন্যান্য বৌদ্ধ তত্ত্ব দ্বারা পরিবেশ এর সমস্যার সমাধান: বৌদ্ধ ধর্মের আধিবিদ্যক তত্ত্বগুলির দ্বারাও পরিবেশ এর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। চারটি আর্যসত্যের আদলে পরিবেশগত সমস্যা এবং তার কারণ ও সমাধানকে বলা যেতে পারে। প্রথমত, পরিবেশগত সংকট সকল জীবের কাছেই দুঃখ। দ্বিতীয়ত, এই দুঃখের কারণ মানুষের অত্যধিক আরামপ্রিয়তার বাসনা। তৃতীয়ত, এই দুঃখের মুক্তি সম্ভব। চতুর্থত, অষ্টাঙ্গিক মার্গ পালন করলে এই দুঃখ থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ আমাদের শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা শেখায়।— অর্থাৎ ৮ টি মার্গ আসলে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন।[১৫] বৌদ্ধ ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এই দর্শন কেবল তত্ত্ব বলে না— প্রয়োগের ওপরও জোর দেয়। নির্বাণকামী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বর্ণিত হলেও ব্যক্তি এই পদ্ধতিগুলি পালন করলে সমাজ তথা পরিবেশও অনেক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচবে। তাই এই পদ্ধতিগুলির জাগতিক সমস্যা সমাধানেও বড় ভূমিকা আছে। শীলের অন্তর্গত হচ্ছে, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম এবং সম্যক্ জীবিকা। সম্যক্ বাক্য হল মিথ্যা কথা না বলা, প্রতারণামূলক বাক্য থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। মিথ্যা কথা না বলে প্রতারণামূলক কর্ম না করলে সেটাই সম্যক্ কর্মে প্রেরিত করে। অসদ্ উপায়ে জীবিকা অর্জন করলেও পরিবেশের ক্ষতি হয়ে থাকে। রাসায়নিক প্রস্তুতকারক সংস্থা কতই পরিবেশ সচেতনতার কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে তারা নদীতে রাসায়নিক ফেলে। চাষি যদি সম্যক্ কর্ম পালন করে, সৎ জীবিকা অর্জন করে, তাহলে সে বেশী লাভের জন্য অতিরিক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করবে না। বিভিন্ন প্যাকেটজাত দ্রব্যেও ভয়ঙ্কর পদার্থ থাকে, যেটা মানুষ তথা পরিবেশের ক্ষতি করে। প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট ঘনত্বের মধ্যে প্লাস্টিক বানানোর কথা সরকার ঠিক করে দিয়েছে। কিন্তু এদিক ওদিক তা বানানো হয়ে থাকছে লুকিয়ে, যা যথেষ্ট পুরু, মাটিতে মেশে না। শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ প্রতিরোধে বেশ কিছু বাজি নিষিদ্ধ করা হলেও সেগুলোর ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। তাহলে আইন করে সব সম্ভব নয়, চাই নৈতিকতার জাগরণ। সম্যক্ কর্মান্তের মধ্যে চুরি, হত্যা করা, মদ্যপান, অবৈধ যৌন আচার থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। এটা করলে প্রাণীহত্যাও বন্ধ হবে। নৈতিক কর্ম করার জন্য মনকে গঠন করা দরকার। তাই ধ্যানের প্রয়োজন, যেটা সম্যক্ সমাধি। এটা অনুশীলন করলে অনৈতিক চিন্তায় মন প্রবৃত্ত হবে না। এর দ্বারা সে প্রজ্ঞা লাভ করবে। এইভাবে মন শান্ত হলে, সঠিক বোধ জাগ্রত হলে অনিত্যতার বোধ, অনাত্মার বোধ হবে। তখন বোঝা যাবে আমার আমার করে আমরা যে এত ভোগবাসনায় লিপ্ত তার কোনো অর্থই নেই। আসলে আমরা সবাই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি— কর্মফলভোগী সত্ত্ব ছাড়া আমরা আর কেউ নই। এইভাবে আমরা জগৎ থেকে নিজেকে আলাদা না ভেবে জগৎ সংযুক্ত রূপে বুঝব, এবং প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বারা বোঝা যাবে যে সবকিছুরই সাপেক্ষ অস্তিত্ব রয়েছে। পরিবেশ ও মানুষ কেউই একাকী সম্পূর্ণ নয়, আমরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল আমাদের অস্তিত্বের জন্য। এছাড়াও পঞ্চশীলের দ্বারা পরিবেশের মঙ্গলসাধন হবে। প্রথম শীল হল অহিংসা— অহিংসক সূত্রে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সর্বজীবের প্রতি হিংসাত্মক

কর্ম থেকে বিরত থাকে, সেই প্রকৃত অহিংসক। বুদ্ধদেব বলছেন, "পানং-ন-হানে"[১৬] অর্থাৎ, প্রাণীকে হত্যা করো না। দ্বিতীয়, অস্তেয় হল, অপরের দ্রব্য গ্রহণ না করা। যথার্থ যুক্তিতে জল, ভূমি, বনের মালিক তো প্রকৃতি, আমরা নই। তাই মানুষের কোনো অধিকার নেই সেগুলোর যথেচ্ছাচারে ব্যবহার করার। ব্রহ্মচর্য হল অবৈধ যৌনসংসর্গে লিপ্ত না হওয়া। এছাড়াও আছে মদ্যপান না করা। যৌনসংসর্গের অবৈধ বাসনা না থাকলে মানুষ প্রকৃতির প্রতিও লোভলালসাপূর্ণ আচরণ করবে না বলা যায়। মাদক দ্রব্য সেবন না করলে অবশ্যই পরিবেশের উপকার হবে। একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তার পরিবার, সমাজ সবার জন্যই ক্ষতিকারক। আমরা প্রায়দিনই দেখি নেশাসক্ত ব্যক্তি অবলা পশুদের ওপর নির্যাতন চালায়। ধূমপানে বায়ুদূষণ হয়। এছাড়াও ব্রহ্মবিহার এর মৈত্রী ভাব শেখায় সকল জীব— একটা ক্ষুদ্র কীট থেকে বৃহৎ প্রাণীকে বন্ধু রূপে দেখতে। জগৎপ্লাবী ভালোবাসা যার হৃদয়ে আছে, অপর প্রাণীর দুঃখে যার হৃদয় করুণায় ভরে যায় সে কী করে উদ্ভিদ বা নিরীহ প্রাণীর ক্ষতি করবে? সে জানে একটা ক্ষুদ্র কীটও মাটিতে না থাকলে ফসল হবে না।

বৌদ্ধ পরিবেশ ভাবনার বিরুদ্ধে ওঠা আপত্তি ও তার উত্তর: বৌদ্ধধর্মের পরিবেশ সচেতনতার বিরুদ্ধে আপত্তি হিসেবে অনেকে বলেন বুদ্ধ তো ধ্যানের জন্য গভীর অরণ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে উপাসনার কথা বলেছেন। তিনি নিজেও সংসারত্যাগী হয়েছেন। এভাবে ব্যবহারিক জীবন থেকে নিভৃতে সরে গিয়ে কীভাবে জগৎ, পরিবেশ নিয়ে ভাবা সম্ভব? 'নাগসূত্ত' তেও বলা হয়েছে যে শুধু নির্বাণকামী ব্যক্তিই নয়, যারা নির্বাণ লাভ করেছে তারাও অরণ্যে থাকবে।

কিন্তু এ আপত্তির উত্তর দেওয়া যায়, যারা দীর্ঘকাল সংসার থেকে আলাদা হয়ে ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছেন, সেইসব ভিক্ষুরা আবার জগতে এসে জগৎ এর কল্যাণকর কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব সেই পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। এছাড়াও Jetsunma Tenzin Palmo-র জীবনই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[১৭] তিনি 1976 – 1988 দীর্ঘ ১২ বছর হিমালয়ে একাকী কাটিয়েছেন। কিন্তু ফিরে এসে তিনি নারীবাদী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। একজন ব্যক্তি নিজেকে কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভোগৈশ্বর্যের মোহ থেকে আলাদা করছে মানে সেটা সেখানকার শেষ নয়, বরং সেটা জগৎ কল্যাণের কাজের জন্য

তাকে আরও উপযুক্ত করে তোলা। Tenzin Palmo-র কাছে এই একাকী থাকার উদ্দেশ্য হল অপরের সেবা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। তিনি বিশ্বাস করেন, "মানুষ যখন নিজেকে বুঝতে শুরু করে, তখনই মানুষ যথার্থ-রূপে অপরকে বুঝতে পারে। কারণ আমরা সবাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।" বুদ্ধও বোধিলাভ করার পর ভূমি ছুঁয়েছিলেন- স্বয়ং ধরিত্রীকে আহ্বান করেছিলেন তাঁর আত্মশুদ্ধি পরখ করার জন্য। যদি তিনি তপস্যার দ্বারা অত্যন্ত বিমুখই হয়ে যেতেন তবে এই আচরণ করতেন না, আর জগতের মানুষের হিতার্থে জগতে ফিরেও আসতেন না। ভিক্ষুরাও যারা পরিবার ছেড়ে সঙ্ঘে থাকেন, সেখানে সঙ্ঘের বাকী সদস্যদের সঙ্গে তাদের মিলেমিশে থাকতে হয়।

উপসংহার: বৌদ্ধধর্ম আসলে মূলে গিয়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। জগৎ এর যান্ত্রিক সমস্যা, এমনকি পরিবেশগত সমস্যাও মানুষের বাসনার কারণে— তৃষ্ণার কারণে— যার সেটা কীভাবে নির্মূল করা যায়, তার উপায় বাতলে দেয় এই মানবতার দর্শন। আইনস্টাইন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন, "ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।"[১৮] অর্থাৎ ধর্ম বা দর্শনেরও ভীষণ গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান যেখানে একটা গণ্ডীর বাইরে গিয়ে আর কিছু করতে পারে না, সেখানে দর্শন পৌঁছাতে পারে, আর বৌদ্ধদর্শন এক্ষেত্রে আলোর দিশারী, যে দর্শন মনকে শুদ্ধ করার কথা বলে। পরিবেশ অবনমন তবেই বন্ধ হবে, যদি মন থেকে কলুষতা, বিদ্বেষ, হিংসা সব অকুশল ধর্ম বিতাড়িত হয়— "অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো"— এই অন্তরকে শুদ্ধ করার,

সৎ চিন্তা করার, সৎ ধর্ম করার, সৎ কাজ বলার কথা বলে গেছেন বুদ্ধ। তাঁর দেখানো পথে বর্তমান পরিবেশগত সংকট থেকেও মুক্তি সম্ভব।

তথ্যসূত্র:

১. United Nations Environment Programme. (1976). Environmental management guidelines. UNEP.

২. Sutta Nipāta, Uraga Vagga, Vasala Sutta. In: The Khuddaka Nikāya. (Trans. Various editions).

৩. Vinaya Piṭaka, Mahāvagga. (Rules regarding harming living organisms in soil and construction).

৪. Cakkavatti-Sīhanāda Sutta (Dīgha Nikāya 26). In: The Dīgha Nikāya.

৫. Vinaya Piṭaka, Pācittiya Rules (Bhūtagāma Vagga – rules on plants and waste disposal).

৬. Vinaya Piṭaka, Ratanavagga (use of animal products restrictions).

৭. Mahāsatipaṭṭhāna Sutta (Dīgha Nikāya 22).

৮. Buddhaghosa. (5th century). Visuddhimagga. (Trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 1956). Buddhist Publication Society.

৯. Buddhaghosa. (5th century). Visuddhimagga (same text—verse reference on forest dwelling).

১০. Dhammapada, Verse 49. In: Narada Thera (Trans.). (1959). The Dhammapada. Buddhist Publication Society.

১১. Dhammapada, Verses 129–130. (Same edition as above).

১২. Mahāsupina Jātaka (Jātaka Tales). In: Cowell, E. B. (Ed.). (1895). The Jātaka or Stories of the Buddha's Former Births. Cambridge University Press.

১৩. Nandivisāla Jātaka. In: Jātaka Tales (same source as above).

১৪. Petavatthu. In: Khuddaka Nikāya.

১৫. Harvey, P. (2000). An Introduction to Buddhist Ethics. Cambridge University Press.

১৬. Pañcaśīla (Five Precepts) – সূত্রভিত্তিক নৈতিক বিধান, বিভিন্ন নিকায়ে উল্লিখিত।

১৭. Tenzin Palmo, J. (2002). Reflections on a Mountain Lake: Teachings on Practical Buddhism. Snow Lion Publications.

১৮. Einstein, A. (1941). Science, Philosophy and Religion: A Symposium. Conference on Science, Philosophy and Religion.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Vidyaranya, S. (1999). Bauddha darshan o dharma. Kolkata: Paschim Banga Rajya Pustak Parsad. (pp. 45–60, 112–130)

২. Sahni, P. (2008). Environmental ethics in Buddhism: A virtuous approach. New York: Routledge. (pp. 78–102)
৩. Burma Tipitaka Association. (1986). The Dhammapada: Verses and stories (Trans. Daw Mya Tin). Rangoon. (Verses 49, 129–130)
৪. Harvey, P. (2000). An introduction to Buddhist ethics. Cambridge: Cambridge University Press. (pp. 35–50, 165–180)
৫. Raghawi. (2023). Protecting environment through teachings of Buddha. Electronic Journal of Social and Strategic Studies, 4. (pp. 12–18)
৬. Siva, C. V. (2016). Buddhist solution for environmental issues. International Journal of Science Technology and Management, 12. (pp. 220–225)
৭. Mukherjee, A. (2019). A role of Buddhism for the solution of today's environmental crisis. International Journal of Applied Social Science, 6(1), 45–50.
৮. Vo Thi, H. (2016). Buddhist ethical views on environmental problems. International Journal of Science and Research. (pp. 1300–1304)
৯. Anand, A. (2016). Environmental crisis: An explanation from Buddhist standpoint. Review Journal of Philosophy and Social Science, 41. (pp. 90–98)
১০. Sangvech, S. P. (2017). Buddhist ethics with solving the environmental problems. Cultural and Religious Studies, 5. (pp. 55–62)
১১. Javanaud, K. (2020). The world on fire: A Buddhist response to the environmental crisis. Religions. (Article ID based / no fixed page)
১২. Intongpan, P. (2019). Climate change through environmental ethics and Buddhist philosophy. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, 8. (pp. 25–32)
১৩. Stott, G. N. (2020). Buddhist approaches to environmentalism and food insecurity. University of New Hampshire. (pp. 10–22)
১৪. Capper, D. (2024). Buddhist environmental ethics & climate change. Religion Compass. (e-publication, no fixed page)
১৫. Tripathi, B. (2017). Environmental pollution and Buddhist philosophy. JETIR, 4. (pp. 410–415)
১৬. Bhutia, K. N. (2023). Buddhist philosophy and environmental protection: Nurturing harmony between nature and mind. IJARIIE, 9. (pp. 300–305)